গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন

bn.wikipedia.org

১৭.০৫.২০২০

গোর্খাল্যান্ড হচ্ছে ভারতের একটি প্রস্তাবিত রাজ্য, যা দার্জিলিং পাহাড় এবং দার্জিলিং পাহাড়ের জনগোষ্ঠী এবং পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্সের ভারতীয় গোর্খা জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন থেকে জাতিগত-ভাষাগত অধিকারের ভিত্তিতে দাবী করে আসছেন।[২] গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন জাতি-ভাষা-সাংস্কৃতিক অনুভূতির কারণে গতি পেয়েছে সেই সকল মানুষের মাঝে যারা নিজেদেরকে ভারতীয় গোর্খা হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।[৩] গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (১৯৮৬-১৯৮৮) এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার (২০০৭–বর্তমান) অধীনে গোর্খাল্যান্ডের জন্য দুটি বৃহৎ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে।

দাবির ইতিহাস

দার্জিলিং এর জন্য পৃথক প্রশাসনিক অঞ্চলের দাবী ১৯০৭ সাল থেকে যখন নিন্টো-মর্লি সংস্কার কমিটির কাছে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি মানুষের অ্যাসোসিয়েশন পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য স্মারকলিপি প্রদান করে।[৪] ১৯১৭ সালে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী অ্যাসোসিয়েশন গভর্নর অভ বেঙ্গল, দ্যা সেক্রেটারি অভ স্টেট অভ ইন্ডিয়া এবং ভাইসরয়ের কাছে দার্জিলিং জেলা ও সংলগ্ন জলপাইগুড়ি জেলাকে নিয়ে পৃথক প্রশাসনিক ইউনিট গঠনের জন্য স্মারকলিপি পেশ করে।

দার্জিলিং এর দৃশ্য যেখানে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন শুরু হয়

১৯২৯ সালে সাইমন কমিশনের কাছে পাহাড়ি মানুষ পূনরায় একই দাবী পেশ করে। ১৯৩০ সালে পাহাড়ীমানুষের এসোসিয়েশন, গোর্খা অফিসার্স এসোসিয়েশন এবং কুরসেওং গোর্খা লাইব্রেরী যৌথভাবে স্টেট অভ ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি স্যামুয়েল হোয়ারের কাছে বাংলা থেকে পৃথক করার পিটিশন জমা দেয়। ১৯৪১ সালে রূপ নারায়ন সিনহার নেতৃত্বে হিলম্যানস এসোসিয়েশন স্টেট অভ ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি লর্ড পেথিক লরেন্সের প্রতি বাংলা প্রদেশ থেকে দার্জিলিংকে পৃথক করে প্রধান কমিশনারের রাজ্য হিসেবে তৈরী করার আহবান জানান।

১৯৪৭ সালে অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) সাংবিধানিক কমিটির কাছে দার্জিলিং জেলা, সিকিম ও নেপালের সমন্বয়ে গোর্খাস্থান গঠনের দাবিতে একটি স্মারকলিপি পেশ করে যার কপি দেওয়া হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি জওহরলাল নেহেরু এবং অর্থ মন্ত্রীলিয়াকত আলি খানকে।

স্বাধীন ভারতে এই অঞ্চলে অখিল ভারতীয় গোর্খা লিগ (ABGL) প্রথম রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে যারা এই সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের দাবীকে সমর্থন করে। ১৯৫২ সালে এন.বি. গুরুং এর নেতৃত্বে দলটি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সাথে কালিম্পংয়ে সাক্ষাৎ করে এবং বাংলা থেকে পৃথক হওয়ার দাবী জানায়।

১৯৮০ সালে ইন্দ্র বাহাদুর রাইয়ের নেতৃত্বে দার্জিলিংয়ের প্রান্ত পরিষদ তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে দার্জিলিংয়ে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা লিখে পাঠায়।

১৯৮৬ সালে গোর্খাল্যান্ডের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে সুভাষ ঘিসিং এর নেতৃত্বে গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (GNLF) সহিংস আন্দোলন শুরু করেছিলো। যার ফলে ১৯৮৮ সালে দার্জিলিং জেলার নির্দিষ্ট এলাকা শাসনের জন্য দার্জিলিং গুর্খা হিল কাউন্সিল (DGHC) নামে একটি আধাস্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। তবে ২০০৭ সালে একটি নতুন দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (জিটিএ) পূনরায় গোর্খাল্যান্ডের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবী উত্থাপন করে।[৫] ২০১১ সালে জিজেএম রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যার অধীনে DGHC এর পরিবর্তে গোর্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসন নামে একটি আধাস্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠিত হবে।

অঞ্চলের ইতিহাস

১৭৮০ সালের পূর্বে দার্জিলিংয়ের এলাকা সিকিমের ছোগ্যালদের মালিকানাধীন ছিলো যারা নেপালের গোর্খাদের বিরুদ্ধে অসফল সংঘাতে জড়িয়ে ছিলো। ১৯৮০ সালে গোর্খারা সিকিম আক্রমন করে এর অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নেয় যার মধ্যে দার্জিলিং এবং শিলিগুড়ি ছিলো। ১৯ শতকের প্রথম দিকে তারা সিকিমের এলাকা পূর্বদিকে তিস্তা নদী পর্যন্ত বাড়াতে থাকে এবং তরাই অঞ্চল জিতে নিয়ে এর সংগে যুক্ত করে।

এরই মধ্যে ব্রিটিশরা পুরো উত্তর সীমান্তে গোর্খাদের শাসন বন্ধ করতে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। ১৮১৪ সালে এংলো-গোর্খা যুদ্ধ শুরু হয় এবং গোর্খারা পরাজিত হয়। ১৮১৫ সালে সুগাউলি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী গোর্খারা সিকিমের

চোগ্যালদের কাছ থেকে যে অঞ্চল (মেচি নদী এবং তিস্তা নদীর মধ্যকার অঞ্চল) করেছে তা নেপালকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

দার্জিলিং ১৮৮০

পরবর্তীতে ১৮১৭ সালে তিতালিয়া চুক্তির মাধ্যমে সীমান্তে গোর্খাদের শাসন বন্ধ করতে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। ১৮১৪ সালে এংলো-গোর্খা যুদ্ধ শুরু হয় এবং গোর্খারা পরাজিত হয়। ১৮১৫ সালে সুগাউলি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী গোর্খারা সিকিমের চোগ্যালদের কাছ থেকে যে অঞ্চল (মেচি নদী এবং তিস্তা নদীর মধ্যকার অঞ্চল) করেছে তা নেপালকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

পরবর্তীতে ১৮১৭ সালে তিতালিয়া চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া সিকিমের চোগ্যালদের অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে এবং এর সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করে।

বিতর্ক এখানেই শেষ হয়নি। ১৮৩৫ সালে সিকিম দানপত্রের মাধ্যমে দার্জিলিং পাহাড়ের ১৩৮ বর্গমাইল (৩৬০ কিমি^{২}) এলাকা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে দিয়ে দেয়। ১৮৬৪ সালের নভেম্বর মাসে সিঞ্চুলা চুক্তি পাশ হয়, যা বাংলা ডুয়ার্স, যা মূলত কুচবিহার রাজ্যের অধীনে ছিলো এবং আঠারোো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভুটান অধিগ্রহণ করে, কালিম্পংসহ কিছু পাহাড়ি অঞ্চল ভুটান ব্রিটিশদের কাছের প্রত্যপণ করে। বর্তমান দার্জিলিং জেলা বলা যেতে পারে ১৮৬৬ সালেই তার বর্তমান রুপ অর্জন করে মানচিত্রে যার আয়তন ১২৩৪ বর্গমাইল।

১৮৬১ সাল এবং ১৮৭০-১৮৭৪ পর্যন্ত দার্জিলিং জেলা ছিল একটি "অ-নিয়ন্ত্রিত এলাকা" (যেখানে ব্রিটিশ রাজের আইন এবং প্রবিধান ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত একইভাবে এই জেলায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োগ হতো না, যদি না বিশেষভাবে তা বর্ধিত করা হতো)। ১৮৬২ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত অঞ্চলটিকে একটি "নিয়ন্ত্রিত এলাকা" হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৮৭৪ সালে "অ-নিয়ন্ত্রিত এলাকায়" শব্দটি পরিবর্তন করে "নির্ধারিত জেলা" করা হয় এবং ১৯১৯ সালে পুনরায় *ব্যাকওয়ার্ড ট্রাক্টস* করা হয়। ১৯৩৫ থেকে ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত এলাকাটি "আংশিক বহির্ভূত এলাকা" হিসাবে পরিচিত ছিলো।

জিএনএলএফের অধীনে আন্দোলন এবং ডিজিএইচসি গঠন

১৯৮০ সালে সুভাষ ঘিসিং ভারতের মধ্যে দার্জিলিং পাহাড় এবং দার্জিলিং সংলগ্ন ডুয়ার্স অঞ্চল, শিলিগুড়ি তরাই এলাকা নিয়ে একটি রাজ্য তৈরির দাবি উত্থাপন

করেন। দাবিটি সহিংসতায় রূপ নেয় এবং ১২০০ এর বেশি মানুষ নিহত হয়। এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৮৮ সালে দার্জিলিং গুর্খা হিল কাউন্সিল (DGHC) গঠিত হয়। এই (DGHC) ২৩ বছর ধরে দার্জিলিং পাহাড়ে এক প্রকার স্বায়ত্তশাসন চালায়।

২০০৪ সালে চতুর্থ DGHC নির্বাচন পিছিয়ে যায়। সরকার সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন আয়োজন না করার এবং সুভাষ ঘিসিংকে DGHC একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক করার পরিবর্তে একটি নতুন ষষ্ঠ তফসিল উপজাতীয় কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। DGHC এর সাবেক কাউন্সিলরদের মধ্যে বিরক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাদের মধ্যে সুভাষ এর সহায়কদের একজন বিমল গুরুং GNLF থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রশান্ত তামাং দার্জিলিং থেকে ইন্ডিয়ান আইডল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং বিপুল পরিমানে আঞ্চলিক জনসমর্থন অর্জন করে। বিমল দ্রুত প্রশান্তকে সমর্থন করেন এবং জনগণ তার পক্ষ নেয়। ফলে তিনি সুভাষকে ক্ষমতার সিংহাসনচ্যুত করতে সমর্থ হন। তিনি গোর্খাল্যান্ডের পক্ষে দাবীর জন্য গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা প্রতিষ্ঠা করেন।[৬]

গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার অধীনে আন্দোলন

২০০৯ সালে সাধারণ নির্বাচনের আগে ভারতীয় জনতা পার্টি আবার ঘোষণা করে তাদের নীতি হচ্ছে ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে এবং তারা ক্ষমতায় গেলে আরো দুটি রাজ্য তেলঙ্গানা এবং গোর্খাল্যান্ড প্রতিষ্ঠা করবে। জিজেএম বিজেপি প্রার্থী যশোবন্ত সিংকে সমর্থন করে যিনি দার্জিলিং লোকসভা আসন থেকে ৫১.৫% ভোট পেয়ে জয়ী হন। জুলাই ২০০৯ সালে বাজেট অধিবেশনে সংসদে তিন সংসদ সদস্য—রাজীব প্রতাপ রুডি, সুষমা স্বরাজ এবং যশোবন্ত সিং গোর্খাল্যান্ড প্রতিষ্ঠার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন।

অখিল ভারতীয় গোর্খা লীগের নেতা মদন তামাং আততায়ীর হাতে নিহত হলে গোর্খাল্যান্ডের দাবী নতুন মোড় নেয়। ২১ মে ২০১০ এ তাকে গোর্খা জনমুক্তির সমর্থকেরা কুপিয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ তুলে দার্জিলিং এর তিন পার্বত্য উপ-বিভাগের দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কার্শিয়াংয়ে তিন দিনের অবরোধ জারী করা হয়।[৭][৮] মদন তামাং হত্যার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেয়, যার উর্ধ্বতন নেতাদের নাম পুলিশের এফআইআর খাতায় ছিলো।[৯]

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ সালে পুলিশের গুলিতে তিনজন জিজেএম কর্মী নিহত হয়,তারা বিমল গুরুং এর নেতৃত্বে গরুবাথানরা থেকে জয়গাঁ অংশ নিতে জলপাইগুড়িতে

প্রবেশের চেষ্টা করে। এর ফলে দার্জিলিং পাহাড়ে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে এবং জিজেএম অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডাকে যা ৯ দিন স্থায়ী হয়।[১০]

১৮ এপ্রিল ২০১১ তে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে জিজেএম প্রার্থী তিনটি দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদের আসনে জয়লাভ করে ফলে দার্জিলিংয়ে গোর্খাল্যান্ডের দাবী যে শক্তিশালী তা প্রমাণিত হয়। জিজেএম প্রার্থী ত্রিলোক দেওয়ান দার্জিলিং আসন থেকে[১১] হরকা বাহাদুর ছেত্রী কালিম্পং নির্বাচনী এলাকা থেকে এবং রোহিত শর্মা কার্শিয়ং নির্বাচনী এলাকা থেকে জয়লাভ করে।[১২] জিজেএম সমর্থিত স্বতন্ত্রপ্রার্থী উইলসন চামপ্রামারি ডুয়ার্সের কালচিনি আসন থেকে জয়লাভ করে।[১৩]

গোর্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসন

১৮ জুলাই ২০১১ সালে দার্জিলিং পাহাড়ের জন্য একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান **গোর্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসন (জিটিএ)** গঠনের জন্য সমঝোতা স্মারক চুক্তি করা হয়।[১৪] এর আগে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন (২০১১) প্রচারণাকালীন সময়ে মমতা ব্যানার্জি প্রতিশ্রুতি দেন যে গোর্খাল্যান্ড সমস্যার সমাধান করা হবে। যখন মমতা একে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সমাপ্তি বলে ব্যক্ত করেন তখন বিমল গুরুং মন্তব্য করেন যে এটা রাজ্য লাভের পথে আরো একটি পদক্ষেপ। শিলিগুড়ির নিকটবর্তী পিনটেইল গ্রামে তারা একই স্থানে প্রকাশ্যে এই বক্তব্য প্রদান করেন যেখানে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিলো।[১৫] ২ সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে জিটিএ সৃষ্টির জন্য একটি বিল ছিল পাশ করে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা।[১৬] ১৪ মার্চ ২০১২ পশ্চিমবঙ্গ সরকার জিটিএ আইনের জন্য একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারী করে, জিটিএ নির্বাচনের প্রস্তুতির সংকেতের জন্য।[১৭] ২০১২ সালের ২৯ জুলাই জিটিএ নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হয়, জিজেএম প্রার্থী ১৭টি নির্বাচনী এলাকা থেকে জয়লাভ করে এবং বাকি ২৮টি আসন ছিলো প্রতিদ্বন্দ্বীহীন।[১৮]

৩০ জুলাই ২০১৩, গুরুং জিটিএ থেকে পদত্যাগ করেন।[১৯]

২০১৩ কার্যক্রম

৩০ জুলাই ২০১৩, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আইএনসি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশের রেজল্যুশন সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করে।[২০] এর ফলে ভারতের মধ্যে দাবী আদায়ে আশার সঞ্চার হয় বিশেষ করে যারা পশ্চিমবংগে *গোর্খাল্যান্ড* এবং আসামে বোডোল্যান্ড রাজ্যের জন্য দীর্ঘদিন আশা করে ছিলো।

৩ দিনের বন্ধের শেষে,[২১] জিজেএম ৩ আগস্ট অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে।[২২] পশ্চিম বঙ্গের সরকারের পক্ষে কলকাতা উচ্চ আদালত বন্ধকে অবৈধ ঘোষণা করে, সরকার তাদের অবস্থান কঠোর করে সহিংস প্রতিবাদ দমন ও বিশিষ্ট জিজেএম নেতা ও কর্মীদের গ্রেফতারের লক্ষ্যে ১০ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী পাঠায়।[২৩] প্রতিবাদে জিজেএম অনন্য একটি পদ্ধতি *জনতা বন্ধের* আশ্রয় নেয়, যাতে কোন পিকেটিং যা বলপ্রয়োগ করা হবে না, পাহাড়ের মানুষকে শুধু ১৩ ও ১৪ আগস্ট স্বেচ্ছায় ঘরের ভিতর অবস্থান করতে আহবান করা হয়।[২৪] এটা বড় একটি সাফল্য এবং সরকারের জন্য লজ্জা হিসেবে প্রমাণিত হয়।

১৬ আগস্ট গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (জিজেএম) কর্তৃক দার্জিলিংয়ে আহূত একটি ম্যারাথন 'সর্বদলীয় বৈঠক' এর পরে গোর্খাল্যান্ডের দলগুলো অনাড়ম্বরভাবে 'গোর্খাল্যান্ড জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি'(GJAC) গঠন করে।[২৫] এবং যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আন্দোলন এবং ভিন্ন নামে বন্ধ চালিয়ে যাওয়ার। ১০৬ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মত পাহাড়ের সব প্রধান রাজনৈতিক দল একসঙ্গে আসতে এবং যৌথভাবে আন্দোলন এগিয়ে নিতে সম্মত হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপের দাবীতে GJAC আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় এমনকি ১৮ আগস্টের পরেও, 'ঘর ভিত্রে জনতা' (ঘরের মধ্যে জনগণের অবস্থান), সেই সঙ্গে জাতীয় মহাসড়কে কালো ফিতা পরিধান করে মশাল মিছিল ও বিশাল মানব বন্ধনের আয়োজন করে।